ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

মূল
কাজী আতাহার মুবারকপুরী ﵀
ড. আহমাদ শালাবী

অনুবাদ ও পরিমার্জন
আবদুল্লাহ জোবায়ের (প্রথম অংশ)
উমাইর লুৎফর রহমান (দ্বিতীয় অংশ)

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না
—তারা কি সমান হতে পারে?”

[সূরা যুমার, ৩৯ : ৯]

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

প্রথম তিন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

অনুবাদকের কথা..... ১৬

নবিজির যুগে জ্ঞানচর্চা ১৮

হিজরতের আগে জ্ঞানচর্চা ১৮
- ⇨ মসজিদে আবু বকর রা..... ১৮
- ⇨ ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব রা.-এর ঘর ১৯
- ⇨ আরকাম রা.-এর গৃহ ১৯
- ⇨ মক্কা এবং মদীনার মাঝে গামীমে জ্ঞানচর্চা ২০

হিজরতের পরে মদীনায় জ্ঞানচর্চা ২১
- ⇨ বনু যুরাইকের পাঠশালা.....২২
- ⇨ মসজিদে কুবার পাঠশালা ২২
- ⇨ নাকিউল খাদিমার পাঠশালা ২৩

মসজিদে নববির কেন্দ্রীয় পাঠশালা..... ২৫
- ⇨ ক্লাসে বসার পদ্ধতি ২৬
- ⇨ আসহাবুস সুফফা ২৮
- ⇨ নবি ﷺ এর মজলিস যেমন হতো ৩১
- ⇨ নববি বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীদের অবস্থা ৩৩
- ⇨ নবি ﷺ এর তালিম প্রদান পদ্ধতি..... ৩৯

ঘরোয়া পাঠশালা ৪৩

নৈশকালীন বিদ্যাপীঠ ৪৪
মুজাহিদদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ৪৪
বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানচর্চা ৪৫

সাহাবায়ে কেরামের যুগে জ্ঞানচর্চা..... ৪৭

মসজিদে জ্ঞানচর্চার মজলিস ৫০
মজলিসের সময়সূচি..... ৫১
মজলিসের পদ্ধতি..... ৫২
হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি ৫৩
তালিমের রীতিনীতি..... ৫৪
গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কয়েকজন সাহাবি ৫৮
উবাই ইবনু কাব রা. ৫৯
উবাদা ইবনুস সামিত রা. ৬১
আবু হুরায়রা রা. ৬২
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. ৬৮
আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ৭১
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা ৭৬

তাবিয়িদের যুগে জ্ঞানচর্চা ৭৯

মদীনার ইলম এবং আলিমগণের শ্রেষ্ঠত্ব ৮১
মদীনার সাত ফকিহ ৮৩
শিক্ষার মজলিস ৮৪
সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহ. ৮৫
উরওয়া ইবনুয যুবাইর রাহ. ৮৬
কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহ. ৮৭
সালিম ইবনু আবদিল্লাহ রাহ. ৮৮
ইবনু শিহাব যুহরি রাহ. ৮৮
রবীআতুর রায় রাহ. ৮৯
নাফে রাহ. ৯০
ইকরিমা রাহ. ৯০
ইবনু আবী যিব রাহ. ৯১
আবু হানীফা রাহ. ৯২
মদীনার দ্বীনি, ইলমি এবং সাহিত্য মজলিস ৯৪

⇨ মাজলিসুল কিলাদাহ ৯৫
⇨ ফকীহ সপ্তকের বৈঠক ৯৬
⇨ আসহাবুশ শূরা তথা উপদেষ্টা কমিটির মজলিস ৯৬
⇨ মাগাযি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মজলিস ৯৬
⇨ যাইনুল আবিদীন এবং উরওয়ার মজলিস ৯৭
⇨ ভাষা-সাহিত্যের মজলিস ৯৭
⇨ আকীক উপত্যকার মজলিস ৯৭
⇨ উরওয়ার কূপস্থ মজলিস ৯৮
⇨ বানুল মাওলার মজলিস ৯৯

দ্বিতীয় অংশ

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন

কৃতজ্ঞ যাদের কাছে ১০২
ড. আর্থার আর্বেরির ভূমিকা ১০৩
ভূমিকা ১০৫
আরবি অনুবাদের ভূমিকা ১১৬

প্রথম অধ্যায় : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ১১৯

১ম ভাগ: মাদরাসা শুরু হওয়ার আগে প্রচলিত পাঠশালা ১২১

১. পঠন ও লিখন শিক্ষায় ক্ষুদে পাঠশালা ১২২
২. কুরআন ও মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার পাঠশালা ১২৬
৩. রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ১৩৫
৪. বই-বিক্রেতাদের দোকান ১৩৯
৫. জ্ঞানী লোকেদের বাড়ি ১৪৩
৬. সাহিত্যের আসর ১৪৮
⇨ সাহিত্য আসরের কিছু নিয়মরীতি ১৪৯
⇨ খলিফাদের পদক্ষেপ ১৫২
⇨ হারুনুর রশিদের শাসনামল ১৫৭
⇨ বাদশাহ মামুনের শাসনকাল ১৫৯
⇨ বাদশাহ মামুনের পরবর্তী যুগ ১৬৩

⇨ জ্ঞানচর্চার বাদশাহি মজলিস ১৬৪
৭. মরুর পাঠশালা ১৭১
⇨ বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ ১৭১
⇨ বিশুদ্ধ ভাষার আবাসস্থল ১৭৪
⇨ মরুর পানে শিক্ষার্থীরা ১৭৫
৮. মসজিদ ১৭৭
⇨ মসজিদ নির্মাণের সূত্রপাত ১৭৭
⇨ মসজিদের বিস্তৃতি ১৭৯
⇨ জামে আল-মানসুর ১৮১
⇨ দামিশকের জামে মসজিদ ১৮২
⇨ জামে আমর ইবনুল আস ১৮৪

২য় ভাগ মাদরাসা ও বিদ্যালয় ১৮৮

ইসলামি বিশ্বে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ১৯২
⇨ নিজামুল মুলকের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ ১৯৩
⇨ নুরুদ্দিন জেনগির প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ ১৯৪
⇨ আইয়ুবি শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ ১৯৫
দুটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা ১৯৯
আল-মাদরাসাতুন নুরিয়াতুল কুবরা ২০০
⇨ মাদরাসা ভবনের নকশা ২০২
⇨ মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী ২০৫
⇨ মাদরাসার যত ওয়াকফ প্রকল্প ২০৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: গ্রন্থাগার ২০৮

গ্রন্থের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন ২১০
গ্রন্থাগারের সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যায়ন ২১৪
গ্রন্থাগার-ভবন ও তার বিন্যাস ২১৭
মধ্যযুগে ইসলামি গ্রন্থাগারের বই-বিন্যাস ২১৯
গ্রন্থসূচি ২২০
গ্রন্থ ধার নেওয়া ২২২
গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণ ২২৫
⇨ এক. পরিচালক (গ্রন্থাগারিক) ২২৫
⇨ দুই. অনুবাদকবৃন্দ ২২৯
⇨ তিন. অনুলিপিকারবৃন্দ ২৩১
⇨ চার. বাঁধাইকারীগণ ২৩৬

⇨ পাঁচ. পরিবেশকবৃন্দ ২৩৮
গ্রন্থাগারের আর্থিক স্থিতি ২৪০
গ্রন্থাগারের প্রকার ২৪২
১. পাবলিক লাইব্রেরি বা গণগ্রন্থাগার ২৪২
⇨ ক) বায়তুল হিকমা ২৪৩
⇨ খ) নাজাফের হায়দারিয়া গ্রন্থাগার ২৪৭
⇨ গ) বসরার ইবনু সিওয়ার গ্রন্থাগার ২৪৮
⇨ ঘ) সাবুর গ্রন্থভাণ্ডার ২৪৯
⇨ ঙ) যাইদি মসজিদের ওয়াকফকৃত লাইব্রেরি ২৫০
⇨ চ) কায়রোর দারুল হিকমা গ্রন্থাগার ২৫১
⇨ ছ) বিভিন্ন মাদরাসায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ২৫৩
২. ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্তরের মাঝামাঝি ২৫৫
⇨ ক) নাসির লিদিনিল্লাহর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ২৫৫
⇨ খ) মুস্তাসিম বিল্লাহর গ্রন্থাগার ২৫৬
⇨ গ) ফাতিমি খলিফাদের গ্রন্থাগার ২৫৭
৩. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ২৬০
⇨ ক) ফাতহ ইবনু খাকানের গ্রন্থাগার ২৬০
⇨ খ) হুনাইনের গ্রন্থাগার (২৬৪ হিজরি) ২৬১
⇨ গ) ইবনুল খাশশাবের গ্রন্থাগার (৫৬৭ হিজরি) ২৬২
⇨ ঘ) মুওয়াফফিকের গ্রন্থাগার (৫৮৭ হিজরি) ২৬৩
⇨ ঙ) জামালুদ্দিন কিফতির গ্রন্থাগার ২৬৪
⇨ চ) মুবাশশিরের গ্রন্থাগার ২৬৪
⇨ ছ) আফরাইমের গ্রন্থাগার (৫০০ হিজরি) ২৬৫
⇨ জ) ইমাদুদ্দিন আসফাহানির গ্রন্থাগার ২৬৫

তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষক-সমাজ ২৬৭

শুরুর কথা ২৬৭
শিক্ষক ও প্রশাসনের মাঝে সম্পর্ক ২৭০
শিক্ষকদের সামাজিক স্তর ২৭৬
⇨ ১. মুআল্লিম বা মক্তবের শিক্ষক ২৭৮
⇨ ২. মুআদ্দিব বা শাহজাদাদের শিক্ষক ২৮৩
⇨ ৩. মসজিদ ও মাদরাসার শিক্ষক ২৮৭
শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ২৯৩
⇨ ১. ক্ষুদে পাঠশালার শিক্ষকগণ ২৯৮

⇨ ২. শাহজাদাদের শিক্ষকগণ ৩০১
⇨ ৩. মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ ৩০৩
নিজামিয়া মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী ৩০৮
⇨ দুটি টীকা ৩১১
সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ৩১৪
শিক্ষকদের আচরণ ও দায়িত্ব ৩১৬
ইজাযত বা শিক্ষকতার অনুমতি প্রদান ৩১৯
⇨ ইজাযতনামার সূত্রপাত ৩২২
⇨ ইজাযতের প্রকারভেদ ৩২৫
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শাস্তি ও দণ্ড ৩২৭
শিক্ষাবৃত্তি ও পুরস্কার ৩৩২
শিক্ষকদের পোশাক ৩৩৪
শিক্ষকদের সমিতি ৩৩৮

চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষার্থী সমাজ ৩৪২

জ্ঞান অর্জনের অনুপ্রেরণা ৩৪২
⇨ কুরআন থেকে কিছু আয়াত ৩৪৩
⇨ হাদিস থেকে কিছু বিবরণী ৩৪৪
⇨ মনীষীদের বাণী ৩৪৫
শিশুদের প্রতিপালন ও সুস্থ বিকাশ ৩৪৬
শিক্ষার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি ৩৫০
প্রতিভা ও ঝোঁক অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান ৩৫৬
শিক্ষার বয়স ৩৫৮
পাঠশালা বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৬১
দেহ ও বোধশক্তি ৩৬৪
শিক্ষার্থীর আদবকেতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য ৩৬৮
শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ৩৭১
ইলম অর্জনে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও সাধনা ৩৭২
ইলমের জন্য দূরদেশে সফর ৩৭৫
নারীদের শিক্ষাদীক্ষা ৩৮৫
⇨ তৎকালীন ইউরোপে নারীশিক্ষা ৩৮৫
⇨ মুসলিম বিশ্বের নারীসমাজ ৩৮৭
নারীদের দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ ৩৯২

⇨ দ্বীনি শিক্ষা..... ৩৯৩
⇨ সাহিত্য সাধনা..... ৩৯৫
⇨ চিকিৎসা-সেবা ৩৯৮
⇨ যুদ্ধে অংশগ্রহণ..... ৪০০
⇨ নারীদের আরও কিছু অবদান ৪০১

প্রথম অংশ

প্রথম তিন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

কাজী আতাহার মুবারকপুরী ﵀

নবিজির যুগে জ্ঞানচর্চা

হিজরতের আগে জ্ঞানচর্চা

হিজরতের আগে মক্কায় এমন কোনো কেন্দ্রীয় স্থান ছিল না, যেখানে মুসলিমরা সুস্থিরভাবে পাঠদান চালিয়ে যেতে পারবে। রাতদিন চলত নানা ধরনের জুলুম-অত্যাচার। নানান অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে হতো তাদের। ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যক্তিত্বই ছিল চলমান পাঠশালা। তবুও কোনো কোনো সাহাবি লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআনের তালিম নিতেন। তালিম দিতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ, আবু বকর ﷺ, খাব্বাব ﷺ-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি। তাই পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে যেসব স্থান এবং মজলিসে কুরআনের তালিম প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোকেই বিদ্যাপীঠ বলা যায়।

❁ মসজিদে আবু বকর রা.

এই ধারাবাহিকতায় নাম আসে আবু বকর ﷺ এর মসজিদের। এটি ছিল একটি খোলা জায়গা। সেখানে আবু বকর ﷺ নামাজ আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তখন মুশরিকদের নারী এবং শিশুরা কুরআন শুনতে ভিড় জমাতো। এই অবস্থা মুশরিকরা মেনে নিতে পারেনি। তারা আবু বকর ﷺ-কে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইবনুদ দাগিনা নামক এক মুশরিক তাঁকে নিরাপত্তা দেয়। আবু বকর ﷺ কিছুদিন সে কথা মেনে চলেন। অবশেষে তিনি ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ বানিয়ে নেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারিতে এসেছে, আয়িশা ﷺ বলেন, '... তারপর আবু বকর ﷺ এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। নিজ ঘরের আঙ্গিনায় তিনি একটি মসজিদ তৈরি

করলেন। যাতে তিনি নামাজ আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন।'[১]

আবু বকর ﵁ এর মসজিদে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ছিল না বটে, তবে এটা ছিল কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম কেন্দ্র। এখানেই কাফিরদের ছোট ছোট সন্তানেরা প্রথম কুরআন শুনতে পায়।

❁ ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব রা.-এর ঘর

ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ﵂ ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ এর সহোদর বোন। স্বামী সাঈদ ইবনু যায়িদ ﵁ সহ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিজ ঘরে খাব্বাব ﵁ এর কাছে কুরআন শিখতেন। ইসলাম গ্রহণের আগে উমর ﵁ উন্মুক্ত তরবারি হাতে বেরিয়েছিলেন। তখন তিনি বোনের ঘরে এসে তাদের কুরআন পড়তে দেখেন। সীরাতু ইবনি হিশামে এসেছে, 'উমর তার বোন এবং ভগ্নিপতির কাছে গেলেন। তাদের কাছে ছিলেন খাব্বাব ইবনুল আরাত। তাদের কাছে ছিল একটি সহীফা, যাতে সূরা ত্ব-হা লেখা ছিল। খাব্বাব ﵁ তাদের দুজনকে সেটা পড়াচ্ছিলেন।'[২]

অতএব ফাতিমা ﵂ এর ঘরকেও কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র বলা যায়। যাতে অন্তত দুজন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক ছিলেন। উমর ﵁ এর বক্তব্যে থাকা 'লোকেরা' শব্দ থেকে দুয়ের অধিক সংখ্যা বুঝে আসে।

❁ আরকাম রা.-এর গৃহ

আরকাম ইবনু আবিল আরকাম ﵁ ছিলেন প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। মক্কায় তাঁর ঘরটি ছিল সাফা পাহাড়ের ওপরে। ইসলামের ইতিহাসে এই জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মক্কা নগরীর অন্যতম বরকতপূর্ণ স্থান। ইতিহাসের পাতায় এ জায়গাটিকে 'দারুল ইসলাম' এবং 'মুখতাবা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছর দুর্বল মুসলমানরা ইথিওপিয়াতে হিজরত করেন। মক্কায় থেকে-যাওয়া মুসলমানরা সম্মুখীন হন কঠিন নির্যাতনের। অবশেষে নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর সাহাবিদেরকে নিয়ে নবি ﷺ আরকাম ﵁ এর ঘরে আশ্রয় নেন। এখান থেকে দ্বীনি দাওয়াতের কাজ পরিচালিত হতো। এখানেই চলত দ্বীন ও কুরআনের তালিম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবি ﷺ সেখানে অবস্থান

[১] বুখারি, ৪৭৬।
[২] সীরাতু ইবনি হিশাম, ১/২৯৫।

করে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতেন। বড় একটি সংখ্যা সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে।[১] পূর্বে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের এখানে দ্বীন ও কুরআনের তালিম দেওয়া হতো। ইমাম আবুল ওয়ালীদ যুরাকি ﵀ *আখবারু মাক্কাহ*-এ লিখেন, 'রাসূল ﷺ এবং সাহাবিগণ আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘরে সমবেত হতেন। সেখানে তিনি কুরআন পড়তেন এবং তালিম দিতেন।'[২]

এই স্থানগুলো ছাড়াও মক্কার বিভিন্ন স্থানে সাহাবিগণ দু-দুজন বা চার-চারজন এক সাথে হয়ে কুরআনের পাঠচক্রে রত থাকতেন। বিশেষত উমর ﵁ দারুল আরকামে এসে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে যায়। তারপর থেকে তারা প্রকাশ্যে কুরআন শোনা এবং শোনানোর কাজ শুরু করেন। মক্কার গিরিপথে তিন বছর আবদ্ধ থাকার সময়ও নবি ﷺ কুরআন পঠন এবং পাঠদানের কাজ জারি রেখেছিলেন। সেখানে আবু তালিবের পরিবারভুক্ত লোকেরা ছাড়া অন্যরাও যে ছিলেন, এটি তো প্রমাণিত। সুতরাং সেখানে তাদের পাঠচক্রের বিষয়টি সুস্পষ্ট।

একইভাবে হাবাশায় হিজরতকারী সাহাবিরাও তালিম প্রদান এবং গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন মুসআব ইবনু উমাইর ﵁। মদীনায় হিজরতের আগে নবি ﷺ যাকে মদীনাবাসীদের শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আরও ছিলেন জাফর ইবনু আবী তালিব ﵁। বাদশাহ নাজাশির দরবারে যিনি মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন। বাদশাহর সামনে তিনি সূরা মারইয়াম তিলাওয়াত করলে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

এই যুগে মুশরিকদের আড্ডা, বাজার, মৌসুমি মেলা এবং হজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে গিয়েও নবি ﷺ কুরআন শোনাতেন। দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ফলে এ জায়গাগুলোও হয়ে ওঠে দ্বীন এবং কুরআনের শিক্ষাকেন্দ্র।

❁ মক্কা এবং মদীনার মাঝে গামীমে জ্ঞানচর্চা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যক্তিসত্তাই ছিল ইসলামি শিক্ষার এক চলন্ত বিদ্যাপীঠ। হিজরতের উদ্দেশ্যে চলতি পথেও তিনি তালিম জারি রেখেছিলেন। মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি গামীম নামক স্থানেও সূরা মারইয়াম শিক্ষা দিয়েছেন।

ইবনু সাদ লিখেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় গামীম নামক স্থানে পৌঁছলে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আসলামি ﵁ তাঁর সাথে

[১] আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ৬১২৯।

[২] আখবারু মাক্কাহ, ২/২১০।

দেখা করতে আসেন। নবি ﷺ তখন দ্বীনের দাওয়াত দিলে, বুরাইদা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ইসলাম কবুল করেন। সেখানে ছিলেন প্রায় আশিটি পরিবার। তারপর নবি ﷺ সবাইকে নিয়ে ইশার নামাজ আদায় করেন। সে রাতে নবি ﷺ বুরাইদাকে সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত শিখিয়ে দেন। বুরাইদা ﷺ বদর এবং উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় উপস্থিত হয়ে উক্ত সূরার বাকি অংশ শিখে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সান্নিধ্যে থাকতে শুরু করেন।'[১]

গামীম হলো মদীনার কাছে রাবিগ এবং জুহফার মাঝামাঝি কিংবা উসাইফান এবং মাররুয যাহরানের মধ্যবর্তী একটি জায়গা। সেখানে আসলাম গোত্রের আশিটিরও বেশি পরিবার থাকত। সে হিসেবে জনসংখ্যার পরিমাণ হবে একশোরও বেশি। তাদের মাঝে বুরাইদা ﷺ এবং তাঁর সাথি ইসলাম গ্রহণ করেন আর সবাই মিলে নবি ﷺ এর ইমামতিতে ইশার নামাজ আদায় করেন। বিভিন্ন কিতাবে বুরাইদার কুরআন শিক্ষাগ্রহণের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

হিজরতের পরে মদীনায় জ্ঞানচর্চা

মক্কায় সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর অসহায় লোকেরাই আগে ইসলাম কবুল করেছিলেন। ফলে তারা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের জুলুমের শিকার হন। পক্ষান্তরে মদীনার মুসলিমদের অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার নেতৃবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং গোত্রের নেতারা স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রসারে তারা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহায়তার হাত। বিশেষত নানান জায়গায় কুরআনী তালিমের বন্দোবস্ত তারা করেছিলেন।

আকাবায় অনুষ্ঠিত প্রথম বাইয়াতের পর মদীনায় কুরআনের চর্চা শুরু হয়। দলে দলে ইসলামের দীক্ষা নিতে শুরু করে মদীনার প্রধান দুটি গোত্র আওস এবং খাজরাযের অভিজাত থেকে সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা। সাধারণ হিজরতের দুই বছর আগেই মদীনাতে মসজিদ তৈরি এবং কুরআনের তালিম শুরু হয়ে যায়। এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আসার দুই বছর আগে থেকেই আমরা মদীনায় অবস্থান করেছি। আমরা তখন মসজিদ তৈরি এবং নামাজ কায়েম করতাম।'[২]

এই দু'বছরের মাঝে নির্মিত মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই তালিম প্রদান করতেন। সেসময় কেবল নামাজই ফরজ হয়েছিল

[১] তবাকাতু ইবনি সাদ: ৪/২৪২।

[২] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ৩৫২৫৮।

বিধায় কুরআনের পাশাপাশি নামাজের বিধান, মাসায়েল এবং নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হতো। পাশাপাশি ছিল তিনটি স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে চলত শিক্ষাকার্যক্রম। সেগুলোতে নগরবাসী ছাড়াও দূরদূরান্তের মানুষজন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

❁ বনু যুরাইকের পাঠশালা

এটির অবস্থান ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল বনু যুরাইকের মসজিদে। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় বনু যুরাইকের মসজিদেই সর্বপ্রথম কুরআনের তালিম শুরু হয়। এখানে তালিম দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন রাফে ইবনু মালিক যুরাকি ﵁। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরাইকের লোক। প্রথম আকাবার দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তাঁকে পূর্বের দশ বছরে নাযিল হওয়া কুরআন শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যার মাঝে সূরা ইউসুফও ছিল। রাফে ﵁ ছিলেন তাঁর গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। মদীনায় ফিরে তিনি গোত্রের মুসলিমদের কুরআন শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেন নিজের এলাকার একটি উঁচু স্থানে। পরবর্তীকালে সেই জায়গাতে নির্মিত হয় মসজিদে বনু যুরাইক। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মসজিদুল গামামার কাছে দক্ষিণ দিকে ছিল এর অবস্থান। মদীনায় আগমনের পর রাফে ﵁ এর শিক্ষাকার্যক্রম দেখে রাসূল ﷺ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এই বিদ্যাপীঠে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিলেন বনু যুরাইকের মুসলমান।[১]

❁ মসজিদে কুবার পাঠশালা

এটির অবস্থান ছিল মদীনার দক্ষিণপ্রান্তে। পরবর্তীকালে এখানে মসজিদ নির্মিত হয়। এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন আবু হুযাইফা ﵁ এর আজাদকৃত দাস সালিম ﵁। আকাবার বাইয়াতের পর অনেক দুর্বল এবং অসহায় মুসলমান হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। সালিম ﵁ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। এখানে ছিল সাদ ইবনু খাইসামাহ ﵁ এর ঘর। যিনি ছিলেন আমর ইবনু আউফ গোত্রের সরদার। আকাবার বাইয়াতের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় তিনি অবিবাহিত থাকায় তাঁর ঘরটি ছিল খালি। ফলে মক্কা থেকে পরিবার ছেড়ে-আসা মুহাজিররা সেখানে অবস্থান করতেন। হিজরতের সময় রাসূল ﷺ কুবাতে কুলসুম ইবনু হিদাম ﵁ এর ঘরে উঠেছিলেন।

---

[১] আল ইসাবাহ: ২/১৯০; ওয়াফাউল ওয়াফা: ২/৮৫; তবাকাতু ইবনি সাদ: ১ম খণ্ড; ফুতূহুল বুলদান: ৪৫৯।

সাদ ইবনু খাইসামার ঘরও ছিল সেখান থেকে কাছেই। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় সেখানে গিয়ে মুহাজিরদের সাথে কুশল বিনিময় এবং আলোচনা করতেন। এই স্থানে শিক্ষকতার দায়িত্বে থাকা সালিম ﷺ এর কুরআন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান ছিল। সাহাবিদের তিনি কুরআন শেখাতেন। আবার নামাজের ইমামতিও ছিল তাঁরই দায়িত্বে। রাসূল ﷺ এর মদীনায় আগমন পর্যন্ত এখানকার শিক্ষাকার্যক্রম চলমান ছিল।[১]

❁ নাকিউল খাদিমার পাঠশালা

এর অবস্থান ছিল মদীনার প্রায় এক মাইল উত্তরে। আসআদ ইবনু যুরারাহ ﷺ এর ঘরে। বনু সালামার মহল্লা পেরিয়ে নাকিউল খাদিমাত নামক স্থানে ছিল এই ঘরটির অবস্থান। আকাবায় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আউস এবং খাযরাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবি ﷺ কাছে কুরআন এবং দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য একজন শিক্ষক প্রেরণের আবেদন করেন। সে প্রেক্ষিতেই মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ-কে তিনি পাঠান। ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে আকাবায় অনুষ্ঠিত প্রথম বাইয়াতের পরপরই মুসআবকে আনসারদের সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি লিখেন, 'আনসার সাহাবিরা বাইয়াতের পরে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, নবি ﷺ তখন মুসআবকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। আনসারদের কুরআন পড়ানো, ইসলামের তালিম দেওয়া এবং তাদের মাঝে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টি করার নির্দেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে মুসআব ﷺ "কারী" হিসেবে মদীনাতে পরিচিতি পান। আসআদ ইবনু যুরারাহ ﷺ এর ঘরে তিনি অবস্থান করতেন।'[২]

এ দুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় কুরআনের তালিম পৌঁছে যায় মদীনার ঘরে ঘরে। মুসআব ﷺ এই দায়িত্বের পাশাপাশি আউস এবং খাযরাজের ইমামতির দায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। তাঁর পাশাপাশি সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম ﷺ। মুসআব ﷺ এর সাথেই তিনি মদীনায় এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারিতে বারা ইবনু আযিব ﷺ এর বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনাতে) মুসআব ইবনু উমাইর এবং ইবনু উম্মি মাকতুম আগমন করেন। তারা দুজনে লোকদেরকে কুরআন পড়াতেন।'[৩]

বারা ইবনু আযিব ﷺ ছিলেন এই বিদ্যাপীঠেরই একজন শিক্ষার্থী। তিনি

---

[১] সীরাতু ইবনি হিশাম: ১/১৪৯৩।
[২] সীরাতু ইবনি হিশাম: ১/৪৩৪।
[৩] বুখারি, ৩৯২৫।

বলেছেন, 'রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের আগেই আমি তিওয়ালে মুফাসসালের কয়েকটি সূরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম।' আরেকজন শিক্ষার্থী যায়দ ইবনু সাবিত ﷺ বলেন, 'রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের আগেই আমি ১৭টি সূরা পড়েছিলাম। তিনি আসার পরে সেগুলো তাকে শুনালে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।'[১]

নাকিউল খাদিমার এই বিদ্যালয় কেবল কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রই ছিল না। বরং মদীনায় মুসলমানদের হিজরত করার আগ পর্যন্ত এটি ছিল ইসলামিক সেন্টার। আউস এবং খাযরাজ দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। হিজরতের পাঁচ বছর আগ অবধি চলমান থাকা এই যুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় 'বুআস যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এতে সাধারণ লোকের পাশাপাশি দু-পক্ষের অভিজাত শ্রেণির অনেকেই নিহত হয়। ফলত গোত্র দুটি ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের আগমন ছিল তাদের জন্য রহমত।

এ সম্পর্কে আয়িশা ﷺ বলেন, 'বুআস যুদ্ধ ছিল এমন এক যুদ্ধ, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন। বস্তুত যা ছিল মদীনাবাসীদের ইসলাম-গ্রহণের পক্ষে সহায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিল নানা দল-উপদলে বিভক্ত। যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল তাদের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি। তখন তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য অনুকূল করে দেন।'[২]

ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁদের মাঝে কিছুটা দূরত্ব ছিল। এক গোত্রের লোকেরা অন্যদের ইমামতি মানতে চাইতেন না। তবে মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ এর ইমামতি তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এক বর্ণনায় এসেছে, এহেন পরিস্থিতে নবি ﷺ পত্র-মারফত মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ-কে জুমুআর নামাজ পড়াতে নির্দেশ দেন। সম্ভবত এই কর্মকৌশল অবলম্বনের কারণে জুমুআ ফরয হওয়ার আগে থেকেই তা মদীনায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। প্রথম জুমুআতে মাত্র চল্লিশজন অংশগ্রহণ করলেও পরবর্তী জুমুআয় মুসল্লিদের সংখ্যা ৪০০ হয়ে যায়। প্রথম জুমুআয় একটি বকরি জবাই করে উপস্থিত মুসল্লিদের আপ্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে গোত্র দুটির লোকদের মনে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক মহব্বত এবং কল্যাণকামিতার প্রেরণা।[৩]

আলোচ্য তিনটি পাঠশালা ছাড়াও মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গোত্রের

---

[১] তাযকিরাতুল হুফফাজ: ১/৩০।

[২] বুখারি, ৩৭৭৭।

[৩] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে তবাকাতু ইবনি সাদ, সীরাতু ইবনি হিশাম, ওয়াফাউল ওয়াফা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

মাঝে জ্ঞানের আসর আর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষত বনু নাজ্জার, বনু আবদিল আশহাল, বনু যফর, বনু আমর ইবনু আওফ, বনু সালিম ইত্যাদি মসজিদের কথা উল্লেখযোগ্য। সেসব মসজিদের ইমামতি এবং শিক্ষাদানের দায়িত্বে ছিলেন উবাদা ইবনুস সামিত, উতবা ইবনু মালিক, মুআয ইবনু জাবাল, উমর ইবনু সালামা, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং মালিক ইবনু হুওয়াইরিস ﷺ।

তৎকালীন পাঠশালাগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত এবং নামাজের বিধান শিক্ষা দেওয়া হতো। কারণ, সেসময় পর্যন্ত ইবাদতের মধ্যে কেবল নামাজই ফরয হয়েছিল। এছাড়াও নবি ﷺ আকাবায় আনসারদেরকে যেসব বিষয়ের ওপর বাইয়াত করেছিলেন, সেসবের ওপর প্রশিক্ষণও ছিল তৎকালীন সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিরা যে বিষয়গুলির ওপর নবি ﷺ বাইয়াত হয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে,

- (ক) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা,
- (খ) চুরি না করা,
- (গ) ব্যভিচার না করা,
- (ঘ) সন্তানকে হত্যা না করা,
- (ঙ) কারো ওপর অপবাদ না দেওয়া,
- (চ) রাসূলের অবাধ্যাতা না করা।

মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ-কে নবি ﷺ যেসব নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিদ্যাপীঠগুলোতে কুরআনের তালিম এবং দ্বীনের পাঠদান চলত। মুখস্থ করানো হতো বিভিন্ন আয়াত এবং সূরা। রাত-দিন বা সকাল-সন্ধ্যার বাঁধাধরা রুটিন সেখানে ছিল না। যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সময় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এভাবে অনেক মানুষ দ্বীনি তালিম গ্রহণ করেন।

মসজিদে নববির কেন্দ্রীয় পাঠশালা

এরপর রাসূল ﷺ মদীনায় আগমন করেন। তারপর মসজিদে নববিতে চালু হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস ছিল, ফজর নামাজের পরে তিনি একটি খুঁটির কাছে চলে আসতেন। দুর্বল-অসহায় মুসলমান, সুফফার সদস্য, কোমলমনা অমুসলিম, বহিরাগত মেহমান এবং প্রতিনিধিরা গোলাকারে সেখানে বসা থাকতেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ-সহ

১ম ভাগ

মাদরাসা শুরু হওয়ার আগে প্রচলিত পাঠশালা

১. পঠন ও লিখন শিক্ষায় ক্ষুদে পাঠশালা

এত প্রচার ও ব্যাপ্তি না পেলেও ক্ষুদে পাঠশালাগুলো ইসলাম-পূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল। মক্কাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আরবি লেখা শিখেন সুফিয়ান বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস এবং আবু কাইস বিন আবদি মানাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব। উভয়ে এ শিক্ষা গ্রহণ করেন হায়রা অঞ্চল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উস্তায—বিশর বিন আবদুল মালিক থেকে।[১] ইবনু খালদুন লেখেন: 'হায়রা অঞ্চল থেকে লিখন শিক্ষা গ্রহণ করেন সুফিয়ান বিন উমাইয়া। কেউ বলেন হারব বিন উমাইয়া। আর তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন আসলাম বিন সিদরাহ থেকে।'[২]

মক্কাবাসী এই ব্যক্তিবর্গ ব্যবসার উদ্দেশে উন্নত দেশ ও শহর ভ্রমণ করে এসব শিক্ষা লাভ করেন। তবে লিখনশৈলীকে আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম পেশা হিসেবে নেন ওয়াদিল কুরা অঞ্চলের এক লোক। তিনি সেখানে অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের লিখনী শেখাতেন।'[৩]

এভাবেই আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে লেখাপড়ার কার্যক্রম। তবে সেই কার্যক্রম ছিল যথেষ্ট ধীর গতির। কারণ ইসলাম আগমনের সময় কুরায়শ গোত্রে পড়াশোনা জানা লোকদের সংখ্যা ছিল মাত্র সতেরো জন।'[৪] তবে এ ধর্মের আবির্ভাব এবং তার ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মানুষকে দারুণভাবে পড়ালেখা শিখতে আগ্রহী করে তোলে। কারণ পড়া ও লেখা—এ দুটি বিষয় তখন অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত যারা ইতিহাস সৃষ্টিকারী নতুন এ যুগে বড় বড় সরকারি পদ ও উন্নত আসনের আগ্রহী ছিলেন, তাদের জন্য। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনায় আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্যও জরুরি ছিল পড়ালেখা করা। কারণ পড়ালেখা না-জানা মুহাদ্দিসদের 'গায়রে সিকা রাবী' (অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) হিসেবে গণ্য করা হতো। পড়ালেখা জানা ছিল তখন হাদিসের শব্দ বর্ণনায় শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের মাপকাঠি।'[৫] এভাবে যখন ইসলামের যুগ সামনে অগ্রসর হতে থাকে, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ও তাঁর পুত্র ওয়ালিদের শাসনামলে নানা শাস্ত্রের বিদেশী গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। তখন শিক্ষিত লোকদের প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এরপর জন্ম নেন জাহিযের

---

[১] বালাযুরি: ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৪৫৭।
[২] আল মুকাদ্দিমা: পৃ ২৯৩।
[৩] বালাযুরী: পৃ ৪৫৭।
[৪] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র।
[৫] আন নাওয়াভী: তাহযিবুল আসমা: পৃ ৭৩।

মতো বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক। যারা পঠন ও লিখনশৈলীকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান, মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে বসান—তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। রিসালাতুল মুআল্লিমিনে তার ভাষায় শুনুন : 'লিখন-পদ্ধতি না থাকলে পূর্ববর্তী কালের লোকদের ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে যেত। বিগত মানবগোষ্ঠীর পদচিহ্ন মুছে যেত। মুখ ও বাক্‌শক্তি হলো তোমার ভিতরকার সাক্ষী। আর কলম হলো তোমার পূর্ব ও পরের সুপ্ত বিষয়ের সংবাদদাতা। তাই কলমের উপকার অনেক ব্যাপক। লেখালেখি ও রচনার প্রয়োজন অত্যধিক। মধ্যস্থতা গ্রহণ করে চলতে অভ্যস্ত শাসক লিখনী যোগ্যতা ছাড়া কখনো তার আশপাশের এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে না। দেশের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। নিজ সাম্রাজ্যে আইনকানুন প্রয়োগ করতে পারবে না। লিখন-পদ্ধতি না থাকলে কোনো কিছুর ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হতো না। কোনো কিছুই সঠিকভাবে পরিচালনা করা যেত না। আমরা দেখেছি, কেবল হিসাব ও লিখন-পদ্ধতির মাধ্যমেই দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং সবকিছুর ভিত্তি সুরক্ষিত থাকে।'[১]

এসব কারণেই মানুষ পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয়। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই আরম্ভ হয় এই শিক্ষাবিপ্লব। এরপর যতই দিন গড়াচ্ছিল, ততই নতুন নতুন কারণ ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে সেই শিক্ষার সৃজনশীল পদ্ধতি উন্নতি হচ্ছিল।

ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে পড়ালেখা জানা মুসলিমদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁদেরকে তাঁর সামনে লেখালেখির কাজে নিযুক্ত করেন।[২]

এ কারণেই মুসলিম ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্ব নেন অমুসলিম নাগরিকগণ। বদর-যুদ্ধে মক্কাবাসী অনেক কাফির যুদ্ধবন্দি হয় মুসলিমদের হাতে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছেলেদের পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্ব দেন।[৩] এভাবেই পড়ালেখা শেখানোকে পেশা হিসেবে নেওয়ার বিষয়টি কাফিরদের কাছে একটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।[৪] তখন কেবল শিক্ষকদের বাড়িতেই শিক্ষাদান কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। অনেক শিক্ষক নিজ বাড়িতেই

[১] হস্তলিখিত পাতা: ৮।

[২] বালাযুরি: ১৪৭, ৪৫৯।

[৩] মুবাররিদ: আল কামিল: Weight ছাপা, পৃ ১৭১।

[৪] বালাযুরি: প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র। আরও দেখুন: Lammens পৃ ৩৬১।

একটি কক্ষ আলাদা করে রাখতেন শিক্ষার্থীদের জন্য। এ ধরনের পাঠশালা ছিল অন্যান্য পাঠশালা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কুরআন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষাদানের জন্য অন্যান্য পাঠশালার কথা আমরা সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এক্ষেত্রে অনেক গবেষক এ দুই ধরনের পাঠশালার মাঝে কোনো তারতম্য না করে এ দুটিকে এক করে ফেলেছেন। তাদের দাবি, সে যুগে কেবল একমুখী শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, যেখানে পঠন ও লিখন শেখানো হতো, কুরআন মুখস্থ করানো হতো এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পাঠ দেওয়া হতো। যেসব গবেষক এমন দাবি করেন, তাদের একজন হলেন ডক্টর ফিলিপ। তিনি এও বলেছেন : 'প্রথম প্রথম পাঠশালাগুলোতে শুধু কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো। শেখানোর বই হিসেবে কুরআনকেই বেছে নেওয়া হতো। ছাত্ররা কুরআন পড়ে পড়ে আরবি পড়া শিখত। এরপর কুরআন থেকে নির্বাচিত অংশ লিখে লিখে তারা লিখন-পদ্ধতি শিখত। এই পড়ালেখার পাশাপাশি তারা আরবি ভাষার ব্যাকরণ, নবিদের ঘটনা, বিশেষত রাসূল মুহাম্মাদের হাদিস শিখে নিত।'[১]

উস্তায মুহাম্মাদ আমিনও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু পাঠশালা ছিল প্রাথমিক পঠন, লিখন ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর কিছু পাঠশালাতে ভাষাসহ অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হতো।'[২] তবে আমি আমার গবেষণার তথ্য-উপাত্ত দ্বারা বুঝেছি যে, এসব পাঠশালা অন্যসব পাঠশালা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র পদ্ধতির ছিল। বিশেষ করে প্রাচ্যের দেশগুলোতে। আমি আমার মতের পক্ষে অনেক প্রমাণও পেশ করব। এসব প্রমাণ নানা যুগে ও নানা প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক ছিল। যার দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার এ দ্বৈত পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে প্রচলিত।

» **এক.** সর্বপ্রথম প্রমাণটি প্রথম ইসলামি যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পঠন ও লিখন শিক্ষাদান ছিল তখন বদর-যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসা কাফিরদের কর্ম। আর স্বাভাবিকভাবেই অমুসলিমদের সাথে কুরআনের বা ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না, যা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। এর পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ কথা প্রসিদ্ধ ও লোকমুখে প্রচলিত ছিল যে, পঠন ও লিখনী শিক্ষাদান মূলত অমুসলিম নাগরিকদের কাজ। অপরদিকে পঠন ও লিখনশৈলী আয়ত্বকারী মুসলিমগণ এ পেশার মাঝে পড়ে থাকত না। কারণ, এরচেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল,

[১] History of the Arabs, P ৪০৮।

[২] দোহাল ইসলাম ২: ৫০।

যার বিবরণ সামনে আসবে।

» **দুই.** এ বিষয়ে আন্দালুসের বিদগ্ধ মনীষী আবু বকর ইবনুল আরাবির (মৃত্যু ৫৪২ হি:) বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'শিক্ষাদান বিষয়ে মুসলিমদের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। সেটি হলো, তাদের সমাজে শিশুরা যখন সামান্য বড় হতো, তখন লিখনী, গণিত ও আরবি ভাষা শিখতে তাদের প্রাথমিক পাঠশালায় পাঠানো হতো। এরপর যখন কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হতো বা বালেগ হতো, তখন তাদের পাঠানো হতো কারী সাহেবদের কাছে। কারী সাহেবগণ মৌখিকভাবে তাদের কুরআন শেখাতেন। এভাবে মৌখিকভাবে শুনে শুনে তারা প্রতিদিন তিন পৃষ্ঠা, পাঁচ পৃষ্ঠা বা দশ পৃষ্ঠা করে হিফজ করত।'[১]

» **তিন.** এরপর আমি উল্লেখ করব মহান পর্যটক ইবনু জুবাইরের (মৃত্যু ৬১৪ হি:) উক্তি, যা তিনি তার আর-রিহলাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— 'প্রাচ্যের এসব দেশে বাচ্চাদের কুরআন শেখানো হতো মৌখিকভাবে। আর লিখন-বিদ্যা তারা শিখত কবিতা ও অন্যান্য বিষয় দিয়ে। কারণ কুরআনের আয়াত লিখলে বাচ্চারা তা বারবার মুছবে, খেলাচ্ছলে যত্রতত্র তা ফেলে দিলে কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। দেশভেদে অধিকাংশ পাঠশালায় মৌখিক শিক্ষাদানের একেক রকম পদ্ধতি চালু ছিল। এভাবে মৌখিক শিক্ষার পাঠশালা ও লিখন শেখার পাঠাশালা ছিল পৃথক পৃথক। এটি খুব ভালো একটি পদ্ধতি। এভাবেই তারা নানা বিষয় শেখার সৌভাগ্য পেয়েছিল। কারণ এক পাঠশালার শিক্ষক অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী হতেন না। সবসময় তিনি তার কর্ম ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন বাচ্চাদের এক বিষয়ের শিক্ষাদানে। আর বাচ্চারাও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখত কেবল এক বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণে।'[২]

» **চার.** একই রকম বক্তব্য ইবনু বাতুতার[৩] (মৃত্যু ৭৭৯ হি:)। তিনি বলেন, 'লেখা শেখানোর শিক্ষক ছিলেন কুরআনের শিক্ষক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লিখনী-শিক্ষক কবিতা ও অন্যান্য বই থেকে ছাত্রদের লেখালেখি শেখাতেন। কুরআনের পবিত্রতা রক্ষার্থে কুরআনের আয়াত তারা ফলক বা কাঠে লিখতেন না। এভাবে (মৌখিকভাবে কুরআন পড়া শেষে) ছাত্ররা লিখনীর ক্লাসে চলে যেত। কারণ লিখনী-শিক্ষক অন্য কিছু শেখাতেন না।'

---

[১] আহকামুল কোরআন ২: ২৯১।

[২] আর-রিহলাহ, পৃ ২৭১।

[৩] তুহফাতুন নাযযার ১: ২১৩।

» **পাঁচ.** ইবনু খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হি :) বলেন, 'প্রাচ্যে লিখনী শিক্ষাদানের এক বিশেষ রীতি চালু ছিল। অন্যান্য বিদ্যা ও শিল্পের মতো সে জন্য শিক্ষকও ছিলেন বিশেষ ও স্বতন্ত্র। তারা বাচ্চাদের ক্ষুদে পাঠশালায় আসতেন না। আর যখন তারা বাচ্চাদের জন্য কাঠে লিখে দিতেন, তখন অত্যধিক সুন্দর করে লিখতেন না। কারণ তখন লিখন-বিদ্যার সমাদর ছিল। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করে আগ্রহীদের লিখনী শিক্ষা শিখতে হতো।'[১]

এসব বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, এ প্রাথমিক ও ক্ষুদে পাঠশালাগুলো ছিল ইসলামি বিশ্বের সর্বপ্রথম বিদ্যালয়। আরবি শব্দটি হচ্ছে كُتّاب 'কুত্তাব' যা মূলত الكِتابة التكتيب (লিখন ও লেখানো) থেকে এসেছে। অর্থাৎ এ ক্ষুদে পাঠশালাগুলোর প্রধান দায়িত্ব ছিল লেখা শেখানো। লিসানুল আরব অভিধানে শব্দটির অর্থও এ রকম দেওয়া হয়েছে : 'কুত্তাব হলো যেখানে লেখা শেখানো হয়।'[২] আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাও এর সমর্থক। কারণ, কুত্তাবে শুধু লিখন ও পঠন শিক্ষা দেওয়া হতো। যেহেতু শিশুরা এসব কুত্তাবে প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করে বড় হয়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করত, তাই বিশেষায়িত এসব প্রতিষ্ঠানের গায়েও কুত্তাব নাম পড়ে যায় (আমাদের উপমহাদেশে একে মক্তব বলা হয়)। এরপর এ পরিভাষাটি ব্যাপক প্রচার পায়। এভাবেই বাচ্চাদের কুরআন এবং পড়ালেখা শেখার জন্য নির্দিষ্ট সব রকম পাঠশালার নাম হয়ে যায় কুত্তাব (বা মক্তব)। এ কারণেই লিসানুল আরব রচয়িতা মুবাররিদ মাকতাবের অর্থ করেন 'শিক্ষাকেন্দ্র'।[৩] তবে এর দ্বারা তখনকার স্বাভাবিক পাঠশালার চিত্র ফুটে ওঠে না। উভয় পাঠশালা একাকার হয়ে একই পদ্ধতির পাঠশালা হয়ে গেছে—এ কথা বোঝায় না।

২. কুরআন ও মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার পাঠশালা

ধর্ম ও নীতি বিষয়ক আলোচনায় মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের শিক্ষা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন গোল্ড যিহার (Goldziher)। সেই প্রবন্ধে তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন ও ইসলাম ধর্মীয় মৌলিক

[১] আল মুকাদ্দিমা: ৩৯৮।
[২] লিসানুল আরব ২: ১৯৩।
[৩] লিসানুল আরব ২: ১৯৩।

কিলাব বিন হামরাহ।[১]

৮. মসজিদ

ইসলামি শিক্ষা ও পাঠদানের ইতিহাসের সঙ্গে মসজিদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তাই মসজিদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা মানে ইসলামি সভ্যতা বিকাশের প্রাণকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করা। যখন থেকে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়, তখন থেকেই তাতে শিক্ষাদান কার্যকক্রম শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামি ভূখণ্ডের নানা প্রান্তে এভাবেই মসজিদ-কেন্দ্রিক নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান চলে আসছে। মসজিদকে শিক্ষালয় হিসেবে নির্ধারণের প্রধান কারণ হলো: ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে দ্বীনের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। ধর্মের মূল ভিত্তি, বিধিবিধান ও উদ্দেশ্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হতো। আর ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে মসজিদের ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া প্রথম যুগের মুসলমানগণ মসজিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে মসজিদকেই তাঁরা ইবাদতখানা, শিক্ষাকেন্দ্র, বিচারালয়, সেনা সমাবেশ প্রাঙ্গন ও রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানানোর স্থান হিসেবে বেছে নেন।[২]

❁ মসজিদ নির্মাণের সূত্রপাত

কেন মুসলমানগণ দ্রুত মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন? কারণ তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সম্মিলিতভাবে ঘরোয়া পরিবেশে ইবাদত করতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ইচ্ছামতো সেখানে ইবাদত ও নবিজির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এই চিন্তা থেকেই তাঁরা মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে এর নাম দেন 'আল্লাহর ঘর'। এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এ ঘর কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এ স্থানে প্রবেশ করতে কারও অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সেই সমাজে অনেক ইহুদি-খ্রিস্টানও বাস করত। তাদের জন্য ছিল পৃথক উপাসনালয়। সেখানে তারা আল্লাহর নাম জপত। উপাসনা করত। আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, আরব মুসলমানগণ তাদের ইসলামপূর্ব সমাজের অনেক রীতিনীতির অনুসরণ করেছেন। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিম ও

---

[১] আল ফিহরিস্ত: পৃ ৬৬, ৬৯, ১২২।

[২] দেখুন: দাইরাইতুল মাআরিফিল ইসলামিয়ার মসজিদ অধ্যায়।

ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম দীর্ঘকাল আগে পবিত্র 'মসজিদুল হারাম' নির্মাণ করে যান। মক্কায় ইসলাম আসার পূর্বেও একে সবাই কাবা হিসেবে জানত। কাবাঘরের উদ্দেশ্যে হজ পালন করতে আরবের নানা প্রান্ত থেকে হাজিরা আসত মক্কায়। তাতে ইবাদত-বন্দেগি করত।[১] এই সুমহান ঘরকে মহান আল্লাহ নামাজ আদায়কারী, তাওয়াফকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী সকলের জন্য নির্বাচন করেছেন। মুশরিকরা কাবায় মূর্তি স্থাপন করে তার পূজা করত। তাওহীদবাদীরা তাতে ইবাদত-বন্দেগি করত। ইসলাম আসার পর মুসলমানগণ এ কাবার ভাবগাম্ভীর্য আরও উন্নত করেন। বাইতুল্লাহর মর্যাদা আরও মহিমান্বিত করেন। এমনকি মূর্তি অপসারণের আগেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনুল আসওয়াদ ও রুকনুল ইয়ামানির মধ্যবর্তী জায়গাকে নামাজের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন।[২] মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় এ পুণ্যময় ঘরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহর জমিনের মধ্যে তুমিই সবেচেয়ে প্রিয় আমার কাছে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছেও তুমি সব থেকে প্রিয় জায়গা। তোমার আশপাশের বাসিন্দাগণ যদি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, তবে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।[৩]

এরপর মুসলমানদেরকেও মক্কা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদুল হারামে জমায়েত ও ইবাদত থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। ফলে খুব দ্রুত তারা এর বিকল্প কিছুর চিন্তা করতে থাকেন। মদিনার দিকে হিজরতের পথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবা প্রান্তরে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নির্মিত এ মসজিদের নাম হলো মসজিদে কুবা। বলা হয়, এ মসজিদক কেন্দ্র করেই নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

> **'তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের**

[১] শাহরাস্তানী: আল মিলালু ওয়ান নিহালু: ৪৪২-৪৪৩।
[২] ইবনু হিশাম: ১: ২১৮।
[৩] আর রাউযুল আনিফ: সুহাইলী: ২: ৩।

ভালোবাসেন।'[১]

বালাযুরি লেখেন :[২] মহানবির আগে যারা মদিনায় হিজরত করেন, তারাই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এরপর মদিনায় প্রবেশের পর তিনি একটি উন্মুক্ত ময়দানে মদিনার মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজে তাতে অবস্থান করেন, মুহাজির ও আনসার মুসলমানদেরও তাতে অবস্থান করে ইবাদত করতে উৎসাহ দেন।[৩] বালাযুরি ও ইবনু হিশামের অন্যান্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আয়াতটি মসজিদে কুবাকে কেন্দ্র করে নয়। বরং মদিনার মসজিদকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ। তা ছাড়া মসজিদে নববিতে যেভাবে আল্লাহর রাসূল আপন সঙ্গীদের ধর্মীয় ও নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন[৪], তেমনি মসজিদে কুবাতেও জ্ঞানের পাঠদান অব্যাহত ছিল।[৫]

❁ মসজিদের বিস্তৃতি

এরপর মসজিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ইসলামের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদেরও বিস্তার ঘটে বিপুল পরিমাণে। নতুন কোনো এলাকা বিজয় করার পর অথবা কোনো নতুন শহর নির্মাণের পর সেনাপতি বা বিজেতা তাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন—এটি একটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে পাওয়া যায় : নানা দেশ যখন ইসলামের পতাকাতলে আসে, তখন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার গভর্নর আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি জামে মসজিদ এবং প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। জুমুআর দিন সবাই জামে মসজিদে চলে আসত। তা ছাড়া কুফার গভর্নর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং মিশরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছেও তিনি একই নির্দেশ প্রেরণ করেন।[৬]

কালের পরিক্রমায় বিপুল হারে মসজিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে রাজধানীগুলোতে। হিজরি তৃতীয় শতকেই মসজিদের নগরী হিসেবে

---

[১] সূরা তাওবা: ৯: ১০৮।
[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃ ১৭।
[৩] ইবনু হিশাম: ২: ১২ তাবারী: ১: ৩: ১২৫৯, বালাযুরি ২০, ফুতুহুল বুলদান পৃ ১৭।
[৪] আল বুখারি: সালাত অধ্যায়।
[৫] আল ইহয়া: ১: ৫২।
[৬] আল-খুতাত ২: ২৪৬, হুসনুল মুহাযারা: ২: ১৪৯।

পরিচিতি পায় বাগদাদ। ইয়াকুবি লেখেন :[১] বাগদাদ নগরীতে ত্রিশ হাজার মসজিদ গণনা করেছি।[২]

মিশরের অবস্থাও বাগদাদ থেকে খুব একটা ভিন্ন ছিল না। তবে হ্যাঁ, মিশরে জামে মসজিদের সম্প্রসার তুলনামূলক ধীর গতিতে হয়েছে। কায়রোতে নির্মিত সর্বপ্রথম জামে মসজিদ হলো জামে আমর ইবনুল আস। যেটি আজ পর্যন্ত স্বমহিমায় বিদ্যমান। মিশর বিজয়ের পরপরই তিনি মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৩৩ হিজরি পর্যন্ত আমর ইবনুল আস মসজিদ ছাড়া আর কোনো জামে মসজিদ ছিল না মিশরে। এ বছরই সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করতে আবদুল্লাহ বিন আলি আব্বাসীয় সেনাদল নিয়ে মিশরে আগমন করেন। আব্বাসীদের বিজয়ের পরপরই মারওয়ান মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আব্বাসী সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন আলি তার সেনাদল নিয়ে ফুসতাত নগরীর উত্তর দিকে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে তিনি অনেক বসতঘর ও প্রচুর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এর মধ্যে আল-আসকার জামে মসজিদ অন্যতম। আল-কাতায়ে এলাকায় ২৬৫ হিজরিতে আহমাদ বিন তুলুন স্বনামে জামে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে জুমুআর নামাজ স্থানান্তরিত করেন। এর আগ পর্যন্ত আল-আসকার জামে মসজিদে জুমুআ আদায় হতো।[৩]

জাওহার সাকলী ৩৬০ হিজরিতে আল-আযহার জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ৩৭৮ হিজরি থেকে এটিকে কেবল গবেষণালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। সেই থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটি ইসলামি বিশ্বের প্রথম সারির একটি বিদ্যাপিঠ।[৪] বিখ্যাত শাসক আযিয বিল্লাহ আরেকটি জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও তা সমাপ্ত করতে পারেননি। এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র হাকিম অসমাপ্ত কাজ শেষ করে এর নাম দেন আল-হাকিম জামে মসজিদ। তা ছাড়া জামে আল-মাকিস ও জামে রাশিদাও নির্মাণ করেন শাসক হাকিম। এরপর জামে মসজিদ নির্মাণের ধারাবাহিকতা বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুবি রাজবংশের হাতে ক্ষমতা আসার পর মিশরে এই ছটি জামে মসজিদই বিদ্যমান ছিল।[৫]

---

[১] আল বুলদান: পৃ ২৫০।

[২] ইয়াকুবি এখানে অত্যুক্তি করেছেন এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ বিশাল বাগদাদ শহরের সর্বত্রই ছিল পাঞ্জেগানা মসজিদ। বলা হয়, প্রতিটি বাড়ির একপাশে নির্দিষ্ট একটি জায়গা বরাদ্দ রাখা হতো নামাজের জন্য। ওই স্থানকেও তারা মসজিদ বলত।

[৩] তারিখুল জামি‘ আত তুলুনী: মুহাম্মাদ উকুশ।

[৪] Lane- Poole: Cairo: ১২৩-১২৪।

[৫] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ২৪৪-২৪৫, সুয়ুতি: হুসনুল মুহাযারা: ২: ১৪৮।

এই ছিল জুমুআ আদায়ের জন্য বিখ্যাত মিশরেরর জামে মসজিদসমূহের বৃত্তান্ত। এ ছাড়া কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত মসজিদসমূহের সংখ্যা ছিল প্রায় বাগদাদের মতো। মিশরে তখন প্রচুর পরিমাণে পাঞ্জেগানা মসজিদ ছিল। উদাহরণস্বরূপ : আলেকজান্দ্রিয়ার মসজিদগুলো সম্পর্কে ইবনু জুবাইর বলেন, সবচেয়ে বেশি মসজিদ ছিল এই নগরে। অনেকে বলেন, এখানকার মসজিদ সংখ্যা বারো হাজার। মোটকথা, বিপুল পরিমাণে মসজিদ ছিল সেখানে। একই পাড়ায় চারটি বা পাঁচটি করে মসজিদ পাওয়া যেত।[১]

এখন আমরা এসব মসজিদের পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করব। এসব মসজিদে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের মজলিস সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা তিনটি মসজিদকে বেছে নিচ্ছি :

❁ জামে আল-মানসুর

বিখ্যাত শাসক মানসুর ইসলামি বিশ্বের জন্য নতুন রাজধানী নির্মাণে মনোযোগ দেন। ১৪৫ হিজরিতে তিনি বাগদাদকে স্বর্ণখচিত প্রাসাদ ও জামে আল-মানসুর দিয়ে সুশোভিত করার পরিকল্পনা হাতে নেন।[২] ইয়াকুতের বর্ণনানুযায়ী এ প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ আঠারো মিলিয়ন দিনার। বাদশাহ রশিদের শাসনামলে জামে আল-মানসুরকে সংস্কার করা হয়। অনেক কিছু তাতে যোগ করা হয়। এরপর সময়ের প্রবিক্রমায় তাতে আরও সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে।[৩]

এ ঐতিহাসিক মসজিদ ছিল তৎকালীন বিদ্যার্থী ও জ্ঞানবাহকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বিজ্ঞানী ও মনীষীগণ সবসময় এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখার আশা পোষণ করতেন। এর প্রমাণ হলো, খতিব বাগদাদী হজে গিয়ে যমযমের পানি পান করে আল্লাহর দরবারে তিনটি প্রয়োজন পূরণের জন্য দুআ করেন। সেই প্রয়োজন তিনটির একটি ছিল : জামে আল-মানসুরে হাদিস সংকলনের সুযোগ পাওয়া।[৪] আমার ধারণা, পঞ্চম শতাব্দীতে হাম্বলী মাযহাবের লোকদের দাপট ও প্রভাব বেশি ছিল এ মসজিদে। এমনকি ৪৫১ হিজরিতে তারা সেখানকার শিক্ষক খতিব বাগদাদীর ওপর বাড়াবাড়ি করে।

---

[১] আর রিহলাহ: পৃ ৪৩।

[২] মু'জামুল বুলদান: ২: ২৩২।

[৩] আল খতিবুল বাগদাদী: কারিখু বাগদাদ: ১: ১০৮।

[৪] ইয়াকুত: মু'জামুল বুলদান: ১: ২৪৬-২৪৭।

নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়।[১] ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিতে এ মসজিদেই বসতেন কিসাই। তখন ফারা, আহমার, ইবনু সাদান ছিল তাঁর শিষ্যদের অন্যতম।[২] তা ছাড়া এ মসজিদে বসেই কবিতা রচনা করতেন আবুল আতাহিয়া।

কুফার এক বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, একবার তিনি এ মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক বর্ষীয়ান শিক্ষকের পাশে অনেক শিক্ষার্থী বসা। আর সেই শিক্ষক নিচের এ কবিতা উপস্থাপন করছিলেন :

لهفي على ورق الشباب # وغصونه الخضر الرطاب

ذهب الشباب وبان عني # غير منتظر الإياب

فلأبكين على الشبا # ب وطيب أيام التصابي

ولأبكين من البلى # ولأبكين من الخضاب

কবিতাটি বলার সময় তার দু-গাল বেয়ে অশ্রু পড়ছিল। তারপর কুফার ওই বৃদ্ধ লোকটিও সেই পাঠশালায় বসে এ কবিতাটি লিখে নেন। ওই বর্ষীয়ান শিক্ষকের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে শিক্ষার্থীরা বলল, ইনি হলেন আবুল আতাহিয়া।[৩] আল-মানসুর জামে মসজিদেই আবু উমর যাহিদ তাঁর বিখ্যাত *আল-ইয়াকুত* গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। ৩২৬ হিজরিতে তিনি এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। গ্রন্থ সংকলন শেষে তিনি বইটির পুনর্পাঠ করে তা আরও সুবিন্যস্ত করেন। তাতে আরও অনেক কিছু যোগ করেন।[৪]

❁ দামিশকের জামে মসজিদ

ইবনুল ফকিহের বর্ণনা অনুযায়ী[৫] দামিশকের জামে মসজিদ হলো তৎকালীন পৃথিবীর চারটি বড় আশ্চর্যের একটি। এ মসজিদের ভাব-গাম্ভীর্য, প্রভাব বলয় ও সভ্যতার বিকাশে এর অবদান সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি।

» এই মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে শাসক ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক

---

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল বুলদান: ১: ২৪৬-২৪৭।

[২] মু'জামুল উদাবা: ৪: ২৪৩।

[৩] আল আগানী: ৩: ১৪৩।

[৪] আল ফিহরিস্ত: ১১৩।

[৫] কিতাবুল বুলদান পৃ ১০৬।

পুরো সাম্রাজ্যের সাত বছরের সমুদয় রাজস্ব ব্যয় করেন। এর ব্যয় হিসাবের নথি, কাগজপত্র ও ভাউচারগুলো আঠারোটি উটে বহন করে বাদশাহ ওয়ালিদের কাছে নিয়ে আসা হয়।

» নির্মাণ কাজ আট বছরব্যাপী চলমান থাকে। এই আট বছরে শ্রমিকগণ যে পরিমাণ খাদ্য আহার করে, তার মূল্য ছয় হাজার দিনার।

» এ মসজিদে বাতি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ছয় শ স্বর্ণখচিত খোপ ছিল।

» মনীষীগণ বলেন, দামিশকের এ মসজিদের সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো, এক শ বছর পর্যন্ত কেউ যদি এ মসজিদে অবস্থান করে, তবুও প্রতি মুহূর্তে এখানে সে নতুন নতুন মজার বিষয় দেখতে পাবে, যা সে আগে কখনো দেখেনি।[১]

তৎকালীন বিশ্বের অত্যাশ্চর্য এ কীর্তি নিয়ে চিন্তা করলে সত্যিই মনে বড় বিস্ময় জাগে।

দামিশকের জামে উমাভীর একাংশের চিত্র

সে কালে কী পরিমাণ মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য ও প্রভাব বহন করত এ মসজিদ, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমি নিজে তা পরিদর্শনকালে যে কয়টি ছবি ক্যামেরায় ধারণ করেছি, সেখান থেকে দুটি ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি (মূল গ্রন্থের ছবিগুলো অস্পষ্ট হওয়ায় বর্তমান মসজিদের চিত্র উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে- অনুবাদক)।

তৎকালীন ইসলামি বিশ্বে যে কয়টি প্রধান ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এই মসজিদ ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। এ মসজিদের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনু জুবাইর বলেন,[২] সেখানে শিক্ষার্থীদের অনেক মজলিস আছে। শিক্ষকদের জন্যও সেখানে প্রচুর ব্যবস্থাদি আছে। মালিকি মাযহাবীদের জন্যে পশ্চিম দিকে আছে একটি প্রান্ত। পশ্চিম দিকের ছাত্ররা ওখানে সমবেত হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত তথ্যসূত্র: ১০৭-১০৮, মু'জামুল বুলদান: ৪: ৭৬-৭৭।

[২] আর রিহলাহ ২৬৬-২৭২।

সেখানে তাদের আছে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও রুটিন। প্রবাসী ও জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এ মসজিদে প্রচুর সেবা ও সুবিধা বিদ্যমান। সবচেয়ে অবাক-করাবিষয় হলো, এ মসজিদের আঙিনায় স্থাপিত দুটি উন্মুক্ত ছোট কক্ষের মধ্যবর্তী যেসব খুঁটি আছে, সেগুলোতে বসার জন্যও নির্দিষ্ট সময় আছে। সেখানে পরস্পর আলোচনা ও পাঠদানের সময় হেলান দেওয়ার জন্য এসব খুঁটিকে ব্যবহার করা হয়। আল-বারিদ ফটকের বাইরে ডান দিকে আছে শাফিয়ি মাযহাবীদের জন্য বিশেষ মাদরাসা। এর মধ্যস্থলে আছে চৌবাচ্চা, তাতে সবসময় পানি প্রবাহিত হয়।

জামে উমাভীর আরেকটি চিত্র

এ মসজিদের অনেকগুলো প্রান্ত আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ লেখার জন্য, কেউ অধ্যয়নের জন্য, কেউ একাকী পড়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করে। এই ছিল মসজিদে ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাসমূহের কিছু বিবরণ।

৪৫৬ হিজরিতে এ মসজিদে খতিব বাগদাদীর বিশাল পাঠশালা ছিল। প্রতিদিন সকালে বিদ্যার্থীরা এখানে জড়ো হতো। তিনি তাদের সামনে হাদিস পাঠ করতেন। তিনি যখন হাদিস পড়তেন, তখন মসজিদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর আওয়াজ পৌঁছাত।[১]

❁ জামে আমর ইবনুল আস

২১ হিজরিতে মিশর-বিজেতা বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস মসজিদটি নির্মাণ করেন। এরপর তাতে একাধিকবার সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়।[২] একেবারে শুরুর দিকে সুলাইমান ইবনু আনায তুজাইবী এ মসজিদে বসে মানুষের সামনে নানা ঘটনা বর্ণনা করে তাদের উপদেশ দিতেন। প্রথমে তিনি বিচার-সালিশের পাশাপাশি এটি করতেন। পরে বিচারকার্য থেকে ইস্তফা দিয়ে কেবল এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৩৮ হিজরিতে তিনি এ মসজিদে শিক্ষাদান

[১] ইয়াকুত: মু'জামুল উদাবা: ১: ২৫৫।

[২] মাকরিযি: আল-খুতাত ২: ২৪৬, ২৫৬।